বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র

মে-জুন ১৯৮০
দাম : ৫০ পয়সা

● ফরাক্কা ব্যারাজ আজ অভিশাপ কেন ?—২ ● পুস্তক পর্যালোচনা—৪ ● তারাপুরে দুর্ঘটনা কিসের ইঙ্গিত ?—৯
● সাম্মানিক স্তরে রসায়নের পাঠ্যসূচী—১০ ● রিপোর্ট—১৩

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি রাজ্যসভার ন' জন সদস্য ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা (ICAR) সম্পর্কে কৃষিমন্ত্রীর কাছে যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা বিজ্ঞানকর্মীদের বিশেষ মনোযোগ দাবী করে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে সব গবেষণা সংস্থার কলেবর ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে সেগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থা যে কতটা স্বৈরতান্ত্রিক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিজ্ঞানবিরোধী তা এই পত্রিকার পাতায় ও অন্যত্র বহুবার আলোচিত হয়েছে, এবং সম্প্রতি এই আলোচনাগুলি অপেক্ষাকৃত সংগঠিত রূপও পেতে শুরু করেছে। ICAR ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ একটি সংস্থা। নামে গবেষণা সংস্থা হলেও এতে যে বিশাল পরিমাণ টাকা খাটছে তার বিচারে এটা একটা বিরাট একচেটিয়া ব্যবসায়ের থেকে আলাদা কিছু নয় ; তফাৎটা শুধু এই যে এর পুরো টাকাটাই আসছে সরকারী সূত্রে, জনসাধারণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্পদ থেকে। ICAR-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা আজ ভারতীয় শাসকশ্রেণীর অন্যতম এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ICAR এর অধিকর্তা সম্প্রতি প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। বিজ্ঞান গবেষণার নামে এই লোকটির জুয়াচুরির খবর আজ কারুর অজানা নয়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ৯৭৯ সালের 'ইয়ারবুক অফ সায়েন্স'-এ এঁর সম্পর্কে যা মন্তব্য করা হয়েছে তা আমাদের জাতীয় লজ্জার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে এঁর প্রতারণার সংবাদ প্রচারিত এবং স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও আজ এই লোক ই এদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম কর্ণধার হয়ে বসেছেন। যে ICAR এঁর পরিচালনায় ভারতীয় কৃষিতে 'যুগান্তর' ঘটিয়েছে বলে নানারকম সরকারী ও আধা-সরকারী সূত্রে দাবী করা হয়ে থাকে, তা আজ স্বৈরতন্ত্র ও দুর্নীতিতে জর্জরিত। এই সমস্ত বিজ্ঞান গবেষণার মানমন্দিরের আড়ালে যে গবেষণার নামে ভুয়া দাবী করা হয়ে থাকে তা সর্বজনবিদিত। গবেষণার নামে মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য এই সংস্থার একাধিক বিজ্ঞানীকে দিনের পর দিন অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে, ও আরও বহু বিজ্ঞানকর্মীকে সইতে হচ্ছে নানা রকমের অন্যায় প্রশাসনিক জুলুম। দেশের বিভিন্ন আদালতে ICAR এর ১০ জন বিজ্ঞানী তাঁদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নানারকম অন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে আবেদন রেখেছেন ও তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য লড়ছেন। এই আভ্যন্তরীণ স্বৈরতন্ত্রের আবহাওয়াতেই বিনোদ শাহের মত বিজ্ঞানীকে বেছে নিতে হয়েছিল আত্মহননের পথ।

বিশালকায় গবেষণা সংস্থাগুলি আজ জনসাধারণের উপর বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এইসব সংস্থার পরিচালক-গোষ্ঠী আজ ভারতীয় শাসক শ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই সত্যটি তুলে ধরা বিজ্ঞানকর্মীদের অন্যতম কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি।

ফরাক্কা ব্যারাজ আজ অভিশাপ কেন ?

[The magic figure of 40 thousand cusecs of water conjured up by the experts as the minimum average year-long increase in Bhagirathi-Hooghly water-flow as a result of Farakka barrage cannot save Calcutta port. It can only bring silt from Nadia and Murshidabad to Calcutta and beyond, thus accelerating the pace of choke-down of the port, apart from eroding relations with Bangladesh. Construction of a barrage on a wide, meandering river is itself a grave blunder—the changing shallows choke sluice gates unexpectedly, while deeps bring forward the danger of erosion of the barrage foundations and barrage collapse.]

ফরাক্কা ব্যারাজ এখন (মার্চ ১৯৮০) সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছে প্রধানতঃ তিনটি কারণে—(১) হুগলী নদীতে সম্প্রতি গড়ে ওঠা অসংখ্য চর (২) হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষায় তথাকথিত ৪০ হাজার কিউসেক জলের অভাব ও (৩) ফরাক্কা অঞ্চলে গঙ্গার ভাঙন। বর্তমান নিবন্ধে ঐ তিনটি বিষয়ে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। অতীতে গঙ্গার ধারা প্রধানতঃ দু'টি পথে বয়ে যেত—পদ্মা আর ভাগীরথী। গত কয়েক শতাব্দীতে পদ্মার ধারা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে আর অন্যদিকে ভাগীরথী দ্রুত শীর্ণকায়া হয়ে বিলুপ্ত হতে চলেছে। ফলে ভাগীরথী-হুগলীর তীরে গড়ে ওঠা কলিকাতা বন্দর ও তার শিল্পাঞ্চল দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সেই কলিকাতা বন্দর তথা সমগ্র পূর্বভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে এজন্য গঙ্গা থেকে হুগলী নদীতে অবিরাম ৪০ হাজার কিউসেক জল প্রবাহ [প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ হাজার ঘনফুট জলের প্রবাহ] আনা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফরাক্কায় গঙ্গার বুকে একটি ব্যারাজ নির্মাণ করা হয় এবং ব্যারাজের ঊর্ধ্বে গঙ্গার জলতল উঁচু করে ২৬ মাইল দীর্ঘ ফীডার ক্যানাল দিয়ে ৪০ হাজার কিউসেক জল ভাগীরথী-হুগলীর বুকে বইয়ে দেওয়া হয়। সেই জল যাতে আবার পদ্মার বুকে ফিরে না যায় সেজন্য জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর উপর একটি ব্যারাজ গড়া হয়। সমগ্র প্রকল্পে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।

এখন হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষায় ৪০ হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ কতদূর কার্যকর তা নিয়ে আলোচনা করব। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' অক্টোবর ১৯৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে আলোচনা করেছি যে, হুগলী নদীতে জোয়ার-ভাঁটায় আনুমানিক ২০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ চলে। সেখানে অনুপ্রবিষ্ট ৪০ হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ যা হুগলী নদীর স্বাভাবিহ প্রবাহের মাত্র ২ শতাংশ, তা নিশ্চয়ই কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু ঐ ৪০ হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ হুগলী নদীর যে অকল্পনীয় ক্ষতি করবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। যেমন মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর খাত যথেষ্ট সংকীর্ণ আর ৬০০ ফুট বিস্তৃত ফীডার ক্যানাল দিয়ে আসা ৪০ হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ ঐ সংকীর্ণ খাত কাটানোর খুবই উপযোগী। ফলে গত ৫/৬ বৎসরে ঐ ৪০ হাজার কিউসেক জল প্রবাহ মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর খাতকে কাটিয়ে গভীর করেছে। কিন্তু চন্দননগরের নীচে হুগলী নদীর বিস্তার ১ হাজার ফুটের অধিক হওয়ায় ঐ জলের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং সেই খাত কাটানো মাটিই বর্তমানে চন্দননগর থেকে কলিকাতার উত্তরে বেলুড় পর্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য বিশাল চর সৃষ্টি করে, যা বর্তমানে সংবাদপত্রে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। আগামী বর্ষায় যখন ভাগীরথী, ময়ূরাক্ষী, অজয় প্রভৃতি নদনদীগুলি দিয়ে ১ থেকে ২ লক্ষ কিউসেকের বন্যা নেমে আসবে, তখন ঐ বিশাল চরগুলি কেটে যাবে। কিন্তু ১ বা ২ লক্ষ কিউসেকের বন্যার সাধ্য নেই ঐ চর কাটানো মাটি দূর সাগর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়। ফলে ঐ চর কাটানো মাটি জমা হবে হুগলী নদীর সেই অঞ্চলে যেখানে নদীর বিস্তার ৩ হাজার ফুটের কাছাকাছি—অর্থাৎ কলিকাতা থেকে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত অঞ্চলে। তাহলে যে মাটি মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর বুকে ঘুমিয়ে ছিল, আমরা ৪০ হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ দিয়ে সেই মাটিকে বয়ে এনে কলিকাতার দক্ষিণে বিশাল চর সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করলাম। যে কলিকাতা বন্দর এমনিতেই আরও ১০ বা ১৫ বৎসর জীবিত থাকতে পারত, আমরা আগামী ২ বা ৩ বৎসরের মধ্যে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিলাম। অর্থাৎ কলিকাতা বন্দরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গড়া প্রকল্পই কলিকাতা বন্দরের দ্রুত মৃত্যুর কারণ হল। কী অপূর্ব আমাদের পরিকল্পনা!

এবার বলি ফরাক্কা ব্যারাজের কথা। ফরাক্কায় গঙ্গানদীর বিস্তার প্রায় দেড় মাইল। সেখানে যে ব্যারাজ গড়া হয়েছে তার ভিত হল ৭ ফুট পুরু সামান্য Arch-shaped কংক্রীট ঢালাই, যা নদীগর্ভে রাখা আছে ৩০ ফুট থেকে ৪০ ফুট গভীর অসংখ্য পাইল-এর উপর। এই ব্যারাজে ১টি লকগেট সহ ১০৮টি স্লুইস্ গেট আছে, যাদের প্রতিটির বিস্তার ৬০ ফুট ও উচ্চতা ২৬ ফুট। কিন্তু যেহেতু ফরাক্কায় গঙ্গানদীর বিস্তার ৭ হাজার ফুটের অধিক, সেহেতু এখানে নদীগর্ভ (River-bed) কখনই সমতল থাকতে পারে না। কোথাও হয়তো থাকে বিশাল চর আবার কোথাও গভীর খাত। এক বর্ষায় যেখানে বিশাল চর, অন্য বর্ষায় সেখানেই হয়তো গভীর খাত। এমনকি কয়েক দিনের মধ্যে কয়েক শো ফুট বিস্তৃত খাত বা চর গড়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। আবার যে কোন ব্যারাজের স্লুইস গেটগুলির নিম্নাংশ নিশ্চয়ই নদীগর্ভে (River-bed-এ) রাখা প্রয়োজন। তাহলে যে গঙ্গাগর্ভ এতই দ্রুত পরিবর্তনশীল, সে নদীতে ব্যারাজ নির্মাণ করা বাস্তবসম্মত হতে পারে কি? গঙ্গার মত নদীতে গভীর খাত ও সুউচ্চ চরের মধ্যে উচ্চতার ব্যবধান ৩০ ফুটের মত হতে দেখা যায়, [দ্রষ্টব্য Farakka Barrage Project: a challenge to engineers, by D. Mookerjea, Proc. Instn. Civ. Engrs. Part I 1975, 58, Feb. 67-84] সেখানে মাত্র ২৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট স্লুইস্ গেটগুলি রাখা যে কখনই সম্ভব নয়, তা আমাদের বিশেষজ্ঞগণ একবারও চিন্তা করলেন না কেন? গঙ্গার এই পরিবর্তনশীল গতিপ্রকৃতি দেখেও কেন বুঝলেন না যে, এরূপ নদীতে ব্যারাজ নির্মাণ করা অসম্ভব? কারণ এক অঞ্চলে সুবিশাল চর সৃষ্টি হয়ে যে কোন মুহূর্তে বহু স্লুইস-গেট বন্ধ হয়ে যেতে পারে আবার অন্য অঞ্চলে গড়ে ওঠা গভীর খাত ব্যারাজের কংক্রীট ভিতকে বিপন্ন করতে পারে। যেমন বর্তমানে গঙ্গার বামতীরে ২৭ ফুট উঁচু বিশাল চর সৃষ্টি হয়ে বহু গেট অকেজো হয়ে পড়েছে আর ডানতীরে ৮২ ফুট গভীর খাতে নদী বয়ে চলেছে [দ্রষ্টব্য যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩শে মার্চ ১৯৮০]। ফলে ডানদিকের ব্যারাজের মূলস্তম্ভ যে কোন সময় ভেঙে যেতে পারে। মনে পড়ে ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে বন্যার কথা যখন একটি গভীর খাত সৃষ্টি হয়ে সদ্য গড়ে তোলা ব্যারাজের ভিতের একাংশ (coffer dam) গঙ্গার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ১৯৮০ সালের বন্যায় ডানদিকের গভীর খাত কি অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবে, যখন ট্রেন ও ট্রাকগুলি ব্যারাজের উপর দিয়ে ছুটে চলবে? বর্তমানে বামতীরের বিশাল চর আর ডানতীরের গভীর খাত থেকে ব্যারাজকে রক্ষার জন্য আমরা শত কোটি টাকা ব্যয় করছি। কিন্তু এরূপ চর ও খাত তো গঙ্গাবক্ষে বারবার নতুন করে গড়ে উঠবে। আমরা কি বারবার শত কোটি টাকা ব্যয় করে চলব ঐ অভিশপ্ত ব্যারাজটি রক্ষা করতে? কাজেই বর্তমানে ফরাক্কায় পৃথিবীর দীর্ঘতম (৭৩৬৩ ফুট) ব্যারাজ গড়ার জন্য আমরা যতই গর্ববোধ করি না কেন, আমার মতে এরূপ অতিবিস্তৃত নদীতে ব্যারাজ নির্মাণ করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা, ফরাক্কা ব্যারাজের বর্তমান দুরবস্থা দেখেও আমরা কোন শিক্ষালাভ করিনি, নতুন করে ব্রহ্মপুত্র নদে ব্যারাজ গড়ার পরিকল্পনা করছি শুধা মরশুমে অকারণে গঙ্গার জল বাড়ানোর জন্য।

এছাড়া ফরাক্কা ব্যারাজের স্লুইস-গেটগুলি গঙ্গাগর্ভ থেকে উঁচুতে রাখার জন্য গঙ্গার খাত প্রায় ২৫ ফুট উঁচু হয়ে উঠবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিহারে বারংবার প্লাবন হবে এবং একটি মহাপ্রলয়ের পর হয় গঙ্গা তার পথকে পরিবর্তিত করবে নয় ফরাক্কা ব্যারাজ ভেঙে পড়বে। একথা পূর্ব প্রকাশিত একটি নিবন্ধে আলোচনা করেছি [দ্রষ্টব্য 'জ্ঞান ওবিজ্ঞান' অক্টোবর ১৯৭৯]। কাজেই যে ফরাক্কা ব্যারাজের সাহায্যে আনীত ৪০ হাজার কিউসেক গঙ্গাজল হুগলী নদীকে ধ্বংস করছে, কলিকাতা বন্দরকে আগামী ২ বা ৩ বৎসরের মধ্যে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এবং যে ব্যারাজ নিজেই যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে অথবা গঙ্গার খাতকে পরিবর্তিত করে লক্ষ লোকের জীবন বিপন্ন করবে, সেই ব্যারাজ নির্মাণ কালে ২০০ কোটি টাকা খরচ করে মূল্যবান সিমেন্ট, লোহা, ইট, প্রভৃতি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়েছি, আবার ২৯৪ কোটি টাকা গঙ্গার বর্তমান ভাঙন-রোধে ব্যয় করতে চলেছি। কিন্তু 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত পূর্বোক্ত ও বর্তমান নিবন্ধ দু'টির আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ২৯৪ কোটি টাকা কেন, হাজার কোটি টাকা খরচ করেও পূর্বভারতের অভিশাপ ফরাক্কা ব্যারাজকে গঙ্গার বুকে রাখা সম্ভব নয়। জানতে ইচ্ছা করে জনগণের এই অর্থ ও সম্পদের অপব্যয় করার কি অধিকার আছে আমাদের পরিকল্পনাকারদের ও ইঞ্জিনীয়ারদের? পৃথিবীর সব দেশে ব্যারাজ গড়া হয় ছোট নদীতে বা নদীপথে যেখানে সঙ্কীর্ণ সেবস্থানে, জলাধারের জল বিতরণের জন্য। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মত অতিবিস্তৃত নদীতে ব্যারাজ নির্মাণ করে হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন কিংবা National Water Grid-এর মত অতি অবাস্তবপ রিকল্পনা শুধু আমাদের দেশেই রচিত। সত্য, কি বিচিত্র এই দেশ!

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে কলিকাতা বন্দরের মৃত্যু কি নিশ্চিত? এ থেকে কি মুক্তি নেই? হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব? তাহলে প্রথমেই ভাবতে হবে, নদীর বুকে জমা চর কাটে কিভাবে? আমরা দেখেছি, যে কোন নদীর চর কাটে বর্ষায় হঠাৎ-নেমে-আসা বন্যাগুলিতে—গ্রীষ্মের জলে তো নয়। তাই হুগলী নদীর চর কাটাতে আমাদের আনতে হবে সেই জলপ্রবাহ—যা নদীর বুকে জমে যাওয়া চরগুলিকে কাটিয়ে সেই মাটি দূরে সাগরে

নিক্ষেপ করবে অথবা প্লাবনের মাধ্যমে দু'তীরভূমিতে ছড়িয়ে দেবে। অর্থাৎ অবিরাম ৪০ হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ নিশ্চয়ই নয়, বর্ষায় গঙ্গাবক্ষে হঠাৎ-নেমে-আসা ১৮ লক্ষ বা ২০ লক্ষ কিউসেকের বন্যাগুলি থেকে কমপক্ষে ৪ বা ৫ লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ হুগলী নদীতে বইয়ে দিতেই হবে এর পুনরুজ্জীবনের জন্য। [এই পরিকল্পনার রূপরেখা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশের অপেক্ষায় আছে] গ্রীষ্মের জল নিয়ে কখনও কোন নদী বাঁচতে পারে না, এ কথাটি না বুঝে আমাদের বিশেষজ্ঞগণ সেই অভিশপ্ত ৪০ হাজার কিউসেক জলপ্রবাহের জন্য গঙ্গার বুকে সর্বনাশা ফরাক্কা ব্যারাজ গড়েছেন, অকারণে শুখা মরশুমে জলবণ্টন নিয়ে বাংলাদেশের সংগে বিরোধ সৃষ্টি করেছেন আর গঙ্গার চেয়ে অধিক বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্র নদে ব্যারাজ গড়ার কথা চিন্তা করছেন। ধন্য, আমাদের বিশেষজ্ঞগণ!

শি রাম বেরা
বিদ্যাসাগর কলেজ

পুস্তক পর্যালোচনা

Small is Beautiful

[Sumachar's theses are examined under the following heads: the basic premises of modern economics, the orientation of twentieth-century industry, the costs of technology import by third world countries like India, leading up to his main proposition: Appropriate, intermediate & people's technology can help developed countries to overcome the three-fold crisis of energy shortage, pollution of the environment and ecological imbalance, and suffocatingly inhuman relations. Developing countries will be able to bypass this type of development while meeting their essential requisites of employment generation and fulfilment of basic needs.

Whether contemporary crisis derives mainly from faulty scales of technology and appropriateness of scale can solve the crisis, how appropriate technology can be implanted on a social scale, from where will spring the new social values concomitant with the desired alteration in scale of technology, these are essential questions thrown up by the seminal work of Sumachar.]

যথাযথ কারিগরী (Appropriate Technology) নিয়ে ভারতে এবং সারা পৃথিবীতেই আলোচনা-বিতর্কের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সুমাচারই সর্বপ্রথম সংগঠিত ও জোরালোভাবে ভিন্নতর কারিগরীর আলোচনা তুলে ধরেন। কেউ কেউ অবশ্য আক্ষেপ করেছেন যে যথাযথ কারিগরীর ভাবনাটি মূলতঃ ভারতীয় হ'লেও, দীর্ঘদিন আমরা ছিলাম উদাসীন, এখন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ সুমাচার যেহেতু এর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, আমরা বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছি (দ্রঃ What is Appropriate Technology—A K. N Reddy, Science Circle Bulletin, Jan. 1980)। সুমাচারের আলোড়নকারী বইটির মর্মবস্তুটিকে এখানে হাজির করার চেষ্টা হয়েছে। বর্তমান আলোচনার শেষ পঞ্চমাংশটুকু ছাড়া সবটুকুই সুমাচারের বই থেকে আহৃত।

আধুনিক অর্থনীতির বনিয়াদ

আধুনিক অর্থনীতির বনিয়াদ রচনাকারী লর্ড কেইনস্ (Lord Keynes) ১৯৩০ সালের দারুণ আর্থিক মন্দার দিনে আমাদের পৌত্রদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—অন্ততঃ আগামী একশো বছর আমাদের ভূমিকা হোক প্রবঞ্চকের (এই নীতির ভিত্তিতে যে) যা কিছু ন্যায়নীতিসম্মত তাই খারাপ এবং যা খারাপ তাই নীতিসম্মত কারণ খারাপটাই উপযোগী, ন্যায়নীতি অকেজো। অর্থলিপ্সা কুসীদজীবিতা ও সাবধানতা আরও কিছুদিন আমাদের ধ্যান জ্ঞান হোক, কারণ কেবলমাত্র এগুলিই আমাদের অর্থনৈতিক সুড়ঙ্গের অন্ধকার থেকে আলোয় পৌঁছে দিতে পারে।" আধুনিক অর্থনীতি যে সব পরা-অর্থনৈতিক (meta-economic) ধ্যান ধারণা দ্বারা

পরিচালিত, তার মূল কথা হল—যা কিছু আর্থিক লাভ এনে দেবে, তা সবই ভালো, আর যা কিছু আর্থিক লাভের পরিপন্থী তাই মন্দ। এমন কি মানবিক আবেগ অনুভূতি, শোক দুঃখ, আনন্দ ভালবাসাকেও তা (টাকার অঙ্কে) পরিমাপ করে ফেলতে চায়। 'শ্রম' এবং 'ভূমি' কে দেখে শুধুমাত্র উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ হিসেবে। অনায়াসে ভুলে যাওয়া হয় যে শ্রমের সঙ্গে মানুষ জড়িত এবং শ্রমিকের দেহ-মনের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি উৎপাদনের সঙ্গে সমলক্ষ্যে বাঁধা থাকা উচিত। ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না যে ভূমি হল মানুষ ও গাছপালাসহ লক্ষ-কোটি জীবের আবাসস্থল। এই ভূমিতেই (topsoil) নিহিত আমাদের প্রাথমিক সম্পদ—কয়লা, তেল, খনিজ—যা একবার খরচ হলে সহজে তৈরী হবার নয় (non renewable)। আর্থিক মুনাফার বিচারে আমরা পৃথিবীর তাবৎ গাছপালা সাফ করে ফেলতে পারি, পৃথিবীর সব নদীর জলকে বিষাক্ত করে তুলতে পারি। বস্তুতঃ বর্তমান যুগের পরা-অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা আমাদের পৌঁছে দেয় একটি মৌল ভ্রান্তিতে—প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে হবে। অথচ আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান। একমাত্র প্রকৃতিতেই সব কিছুর মাপের একটা সামঞ্জস্য আছে। প্রকৃতি জানে কোথায় থামতে হবে—প্রাকৃতিক বৃদ্ধির চেয়েও বিস্ময়কর হল সে বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হওয়া। ভূমি, তাই, শুধুমাত্র খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে লাভজনক ব্যবহারের জন্য নয়, সেইসঙ্গে দেখতে হবে ভূমির স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব যেন ক্ষুন্ন না হয়। ভুল ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ হেন অর্থনীতিও আজ যথার্থ বিজ্ঞান (Perfect Science) হিসেবে পরিগণিত হতে চায় (১৯৬৯ সাল থেকে 'অর্থনীতি বিজ্ঞানে' নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে)।

সুতরাং ভিন্নতর পরা-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন। তার জন্য সব সময় হাতড়ে বেড়ানোরও প্রয়োজন নেই। যেমন, বৌদ্ধ ভাবনায় অর্থনৈতিক আচরণের মূল কথা হল—প্রকৃতি ও গাছপালার সঙ্গে মানুষের আচরণের সামঞ্জস্যবিধান। বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের নিয়মিতভাবে বৃক্ষ রোপণ করতে হতো। শ্রম নয়, শ্রমিকই বৌদ্ধ ভাবনার প্রধান। শিশুর জননী কারখানায় কাজ করবে আর শিশু পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবে, বৌদ্ধ মতানুযায়ী এটা কখনই লাভজনক হতে পারে না।

বিশ শতকী শিল্পের অভিমুখ :

আজকের দুনিয়ার শিল্প ব্যবস্থা এই ভ্রান্ত পরা-অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে। বড় আরও বড়, আরও বেশী যান্ত্রিক ব্যবস্থা, আরও বেশী লাভ—সব শিল্প মালিকেরই লক্ষ্য। যন্ত্র প্রতিবাদ করে না, ধর্মঘট করে না। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিকের উপর নির্ভরশীলতা কমাও। আর শ্রমিককে দিয়ে বেশী কাজ যাতে করানো যায়, তার জন্য তাকে একদিকে যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত কর, অন্যদিকে কিছু পরিমাণ বেকারত্ব বজায় রাখো; তাতে শ্রমিকের বাজার-দরও কম থাকবে। এই শিল্প ব্যবস্থায় মানবিক সম্পর্কগুলো হিংসা আর ঘৃণা দিয়ে ঘেরা। এককথায় বলা যায় বর্তমান শিল্প ও তার আনুষঙ্গিক কারিগরী ব্যবস্থা অমানবিক। এছাড়া আরও দুটি মৌল সংকটের জনক হিসেবে এই শিল্প ও কারিগরী ব্যবস্থা ও নীতিকে চিহ্নিত করা যায়। সেগুলি হল—মানবজীবনের আধার যে জৈব প্রকৃতি তার বিরুদ্ধতা, এমনকি তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টির অতীত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষতঃ জীবাশ্ম-জ্বালানী (কয়লা, পেট্রোলিয়াম) এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে অদূর ভবিষ্যতে সেগুলি নিঃশেষিত হবার সমূহ সম্ভাবনা। ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজির একটি সমীক্ষক দল দেখিয়েছেন যে, বর্তমান সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একাই অন্ততঃ ষোলটি খনিজের পৃথিবীর মোট সঞ্চিত পরিমাণের সিংহভাগ (শতকরা 25-60 ভাগ) ব্যবহার করে থাকে। কাজেই নানা দেশকে বঞ্চিত করে চলতে থাকে তার আহরণ, প্রজ্জ্বলিত থাকে তার ভোগের মশাল। আমেরিকার শিল্পনীতি ও ব্যবস্থা তাই কার্যতঃ অন্য লোকালয়ের উপর এবং প্রকৃতির উপর সহিংস আক্রমণে পর্যবসিত অথবা ধরা যাক জ্বালানীর কথা—অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর আরও অনেক বড় বড় জীবাশ্ম জ্বালানীর আকর (deposit) আবিষ্কৃত হবে ধরে নিয়েও খুব সহজেই দেখা যায় যে, আগামী ২০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর জ্বালানী-চাহিদা প্রাকৃতিক উৎস থেকে মেটানো অসম্ভব। অবশ্য অনেকেই দাবী করতে পারেন যে বাড়তি চাহিদা অনায়াসেই পারমাণবিক শক্তি দ্বারা মেটানো সম্ভব। কিন্তু বিকিরণ রশ্মি—আলফা, বিটা, গামা—কি ইতিমধ্যেই একটা ভয়ঙ্কর ভবিতব্যের ইঙ্গিত বহন করছে না? অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য এই বিকিরণ ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে মস্তিষ্ক ও দেহের কোষে, রক্তের কণিকায় ধ্বংসের যে বীজ বপন করে যায়, বংশ পরম্পরায় তার সঞ্চার রুখবার কোন জ্ঞান আমাদের করায়ত্ব হয়েছে কি? নিশ্চয়ই না। তাহলে আরও বেশী পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন কোন যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য?

আজকের টেকনোলজি স্বশাসন জানে না। কোথায় থামতে হবে তার কোন নীতি বা পদ্ধতি নেই। প্রকৃতির সূক্ষ্ম ভারসাম্যের রাজ্যে টেকনোলজি বিশেষত আধুনিক সুপার-টেকনোলজি : একটি আরোপিত উপদ্রব। প্রকৃতি যে তাকে গ্রহণ করতে পারছে না সে লক্ষণ প্রকট।

ভারত তথা তৃতীয় দুনিয়া : 'কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী'?

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির প্রতি ক্রমাগত আশ্বাস পৌঁছেছে—

তোমরা আমাদের (উন্নত দেশগুলির) পথ অনুসরণ কর, শীগগীরই সুখ ও সমৃদ্ধির মুখ দেখতে পাবে। আর সেই মরিচীকার পিছনে চলেছে তাদের অন্তবিহীন পথপরিক্রমা। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর দরিদ্ররা যদি আজকের তুলনায় মাথাপিছু অন্যূন চারগুণ বেশী শক্তি খরচের অধিকারীও হয়, তবু তখনও, পৃথিবীর মাত্র এক চতুর্থাংশ ধনী দেশগুলি মথাপিছু হিসাবে মোট শক্তির দুই তৃতীয়াংশ খরচ করবে। অর্থাৎ দরিদ্ররা দরিদ্রই থেকে যাবে।

তৃতীয় দুনিয়ার দরিদ্র দেশগুলোতে ক্রমাগত উন্নয়নমূলক দাদন ও সাহায্যের নীট ফলটা জন্ম দিয়েছে এক অদ্ভুত দ্বৈত সমাজের—একদিকে যার আধুনিক ও ধনী শহর, অন্যদিকে দারিদ্র্য, বেকারী ও দুর্দশার সাগরে নিমজ্জিত গ্রাম। উন্নয়ন সাহায্য বাড়িয়ে হয়তো এসব দেশে মাথা পিছু বছরে গড় পরিমাণটা দুপাউণ্ডের জায়গায় তিন বা চার পাউণ্ড (এক পাউণ্ড = প্রায় ১৮ টাকা) করা যায় ; মোট জাতীয় আয়ের হিসেবেও হয়তো উন্নতি দেখানো সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে দ্বৈত সমাজের বিস্তৃতি ও গভীরতা বৃদ্ধি পাবে মাত্র। এই দ্বৈত সমাজের একটি ফসল—গ্রাম থেকে শহরমুখী নিরবচ্ছিন্ন জনস্রোত। আর এক ফসল—দেশ ও দেশবাসী থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায়, যারা অত্যন্ত সুবিধাভোগী একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠী—দেশের দরিদ্র মানুষদের কথা ছাড়া পৃথিবীর তাবৎ সমস্যা নিয়ে এঁরা চিন্তিত। কার্যত এঁরা শহরে সুবিধাভোগীদের একটি ট্রেড-ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। এঁদের দ্বারা দেশের প্রকৃত উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব ?

প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এক চীনা হিসাব অনুযায়ী পাঁচ বছরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স নেবার জন্য একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ব্যয় একজন কৃষকের ১৫০ শ্রম-বছরের সমান। কিন্তু ঐ ছাত্র / ছাত্রী বিনিময়ে দেশের বিরাট সংখ্যক শ্রমিক-কৃষককে কিছুই দিতে পারে না।

আমাদের স্পেশাল শিক্ষা, স্পেশাল সংগঠন, স্পেশাল টেকনোলজি তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই বেখাপ্পা হ'তে পারে। বাইরে থেকে একটি শিল্প কারখানার—ধরা যাক একটি তৈল শোধনাগারের—মাত্র এগার ভাগের একভাগই দৃষ্টিগোচর হয়। বাকী দশভাগ ভাসমান বরফস্তূপের মতই অদৃশ্য। যে সামাজিক পরিমণ্ডলে সেটির অবস্থান তা যদি ঐ অদৃশ্য দশভাগ তৈরী না করে থাকে, তাহলে হয় কারখানাটি অকেজো হয়ে পড়ে নয়তো পদে পদে বিদেশী 'সাহায্যে'র উপর নির্ভরশীল একটি আরোপিত সৌধবিশেষ হিসেবে সেটা ঐ সমাজের ক্ষতি করে চলে।

পণ্য নয়, উন্নয়নের চাবিকাঠি হল মানুষ। উন্নয়ন অর্ডারমাফিক বানানো যায় না বা দক্ষ বিদেশী কারিগর দ্বারা নিপুণভাবে সংস্থাপন করানো যায় না, এমনকি নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করাও যায় না। উন্নয়ন অভিব্যক্ত (evolved) হয়। আর তাই, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রয়োজন বস্তুর নয়, শিক্ষা সংগঠন ও শৃঙ্খলার মত 'অবস্তু'র। তথাকথিত "উন্নয়ন সাহায্যের" (যা কার্যত অনুন্নয়ন সাহায্য) একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ খরচ করেই আসলে গরীব দেশগুলিকে তাদের প্ররোজনীয় 'অবস্তু' গুলি অর্জন করতে ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা যায়।

সমস্যাটা আসলে কুড়ি লক্ষ গ্রামের দুশো কোটি গ্রামবাসীর। সাহায্য দাতা ও সাহায্য গ্রহীতার মধ্যে এখানে তিন সমুদ্রের ব্যবধান—শিক্ষা ও অশিক্ষা, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য, শহুরে ও গ্রাম্য জীবনযাত্রা।

ভারতে আশু জরুরী যা তা হল অন্তত পাঁচকোটি লোকের কর্ম-সংস্থান। ভারতের বাৎসরিক জাতীয় আয় প্রায় পনেরশ' কোটি পাউণ্ড। যদি এমনকি জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচভাগও নতুন কর্মসংস্থানের মূলধন হিসেবে খরচ করা সম্ভব হয়, তবে পাঁচকোটি কর্মসংস্থানের প্রতিটির জন্য পড়ে প্রায় ১৫০ পাউণ্ড। অথচ পশ্চিমী টেকনোলজি ব্যবহার করে কর্মসংস্থান পিছু গড় মূলধনী খরচ পড়ে অন্যূন ২০০০ পাউণ্ড! গরীব দেশগুলি ঠিক এই অসাধ্য সাধনই করতে চায়। যার ফলে কার্যত তারা উন্নত দেশগুলোর প্রয়োজনের ফাঁক-পূরণী ভূমিকা পালন করে। অমুক দেশে শ্রম সস্তা, প্রয়োজনীয় দেখভালের শিক্ষিত কর্মীও সুলভ। অতএব ঐ দেশে কোন ঘড়ি বা কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ বা কোন কীটনাশক তৈরী করা হোক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাও তাই সহজেই হয়ে পড়ে এই ফাঁক পূরণী ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

"বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে" :—

তাহ'লে "কী করিতে হইবে ?" —ক্ষুদ্রত্ব অর্জন করতে হবে, সঠিক ও প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র কারিগরী বেছে নিতে হবে যার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি হবে—

(ক) খুব সস্তা ও কম শক্তি-ব্যয়সাপেক্ষ

(খ) ছোট কারখানায় তৈরী হবার উপযুক্ত

এবং(গ) মানুষের সৃষ্টিশীলতার বিকাশের অনুকূল।

উন্নত দেশগুলি এর মাধ্যমে তাদের মূল ত্রিবিধ সংকট—শক্তির চূড়ান্ত অভাব, আবহাওয়ার চূড়ান্ত দূষীকরণ ও তজ্জনিত প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা এবং শ্বাসরোধকারী অমানবিক সম্পর্ক—থেকে মুক্তির পথ পাবে, আর দরিদ্র দেশগুলি এসব সংকট এড়াতে শুধু পারবে তাই নয়, তাদের অতি প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান ও মৌলিক চাহিদার পূরণ হবে, সৃষ্টিশীল স্বনির্ভর জাতি হিসেবে দাঁড়াবার অবকাশ সৃষ্টি হবে তাদের সামনে।

এই কারিগরীকে বলা যেতে পারে মাঝারি কারিগরী (Inter-

mediate Technology) বা যথাযথ কারিগরী (Appropriate Technology), অথবা একে বলতে পারেন গণ-কারিগরী (Peoples' Technology) বা গণতান্ত্রিক কারিগরী (Democratic Technology) বা স্বনির্ভর কারিগরী (Self help Technology)। এটা শুধু পাল্লার (Scale) প্রশ্ন নয়। অপেক্ষাকৃত বড় সংস্থা ও অপেক্ষাকৃত উন্নত কারিগরী ব্যবহার করেও যদি কর্মসংস্থান পিছু মূলধন খরচের পরিমাণ একটি পূর্বনির্দিষ্ট সর্বাধিক পরিমানের মধ্যে থাকে তবে তাকে যেমন মাঝারি কারিগরী পর্যায়ভুক্ত করা চলে, তেমনি আবার কোন শিল্প আকারে ক্ষুদ্র হলেও যদি তাতে কর্মসংস্থান পিছু খরচ হয় বেশী, তবে তাকে কখনই এই কারিগরীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। অতীত দিনের স্থূল কারিগরী থেকে এ হবে যথেষ্ট উন্নত, কিন্তু বর্তমানের জটিল ও সূক্ষ্ম কারিগরীর তুলনায় এ হবে অনেক সহজ।

বলা হয়ে থাকে যে ছোট বা মাঝারি কারিগরীর পক্ষে ওকালতি-পিছু হঠার পক্ষে ওকালতির সামিল, বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার সামিল। আদৌ তা নয়। বহু সংখ্যক লোকের কিছুই না করার মত অলাভজনক আর কী থাকতে পারে? বিজ্ঞান আজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ, তার জ্ঞানকে শুধু একভাবেই কাজে লাগানো যাবে এ ধারণা ভুল। আরও অভিযোগ করা হয় যে মাঝারি কারিগরীও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উদ্ধার করতে পারবে না। কারণ উৎপাদিত পণ্যের মান হবে বেশ নীচু, রপ্তানী করার অনুপযুক্ত, তাছাড়া এসব দেশে যথেষ্ট সংখ্যক সক্ষম উদ্যোগীর একান্ত অভাব ইত্যাদি। কিন্তু আমরা বড় সহজেই ভুলে যাই যে পৃথিবীর উন্নতি চাঁদ কিংবা জঙ্গল থেকে সাহায্য নিয়ে হয়নি; মানুষ রপ্তানী করে বেঁচে থাকে না; তার চেয়ে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ হ'ল তারা একে অপরের ব্যবহারযোগ্য পণ্য কতটা কী তৈরী করতে পারছে। মোটের উপর মানুষের গোটা সমাজ সীমিত (closed), সেই অর্থে একটা সীমিত সমাজ বলে গণ্য হবার পক্ষে ভারত তো যথেষ্ট বড়। আর উদ্যোগের অভাব? বর্তমানের জটিল কারিগরী এবং অত্যধিক মূলধনী অর্থের প্রয়োজনীয়তাই সমস্ত উদ্যোগ দমিয়ে দেয়। ভারতের প্ল্যানিং কমিশনে এমন লোক আছেন যাঁরা হিসেব করে বসে আছেন যে প্রতিটি কর্মসংস্থানের জন্য ইস্পাত, বিদ্যুৎ ও সিমেন্ট এত এত পরিমাণ দরকার। কিন্তু তাজমহল তৈরী করতে এসবের প্রয়োজন হয়নি; ইয়োরোপের সমস্ত গীর্জাই ইস্পাত বিদ্যুৎ সিমেন্টের তোয়াক্কা না করেই তৈরী হয়েছিল। আসলে প্রয়োজন কী এবং কতটুকু তার সীমা বুঝতে হবে। সকল মানুষের লোভকে প্রশমিত করার মত সম্পদ পৃথিবীর ভাণ্ডারে নেই, কিন্তু তা সকল মানুষের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট—গান্ধীর এই উক্তি সর্বদা স্মরণীয়।

পরিচালনা, মালিকানা ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে ছোট শিল্প শান্তি ও স্থায়িত্বের প্রতীক। প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন করে তা হিংসা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা ডেকে আনবে না। কর্মীরা ও এমন কি মালিক পারস্পরিক পরিচিতি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এক পরিবারভুক্ত লোকের মতই কাজ করতে পারবে। তাই ব্যক্তিগত মালিকানা ছোট শিল্পের পক্ষে স্বাভাবিক, কার্যকরী ও সঙ্গতিপূর্ণ।

কিন্তু শিল্প সংগঠন যত বড় হবে তত তা ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে অনুপযুক্ত ও ক্ষতিকর হতে বাধ্য। বড় শিল্প নিতান্তই যেখানে অপরিহার্য বিবেচিত হবে, সেখানেও ছোট ছোট ইউনিট গড়ে তুলতে হবে। ছোট শিল্পের পণ্যের বাজারও একটা সমস্যা হ'তে পারে, তবে সেটা স্থানীয় লোকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর সমস্যা। শুরুতে, একসঙ্গে অনেকগুলি শিল্প স্থাপন এবং বৃহৎ আকারে সরকারী (উন্নয়ন মূলক) কাজের প্রকল্প এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন নয়, তর্কও উঠুক কিন্তু লক্ষ্য সংকটের অবসান

এতক্ষণ যা বলা হ'ল তা সুমাচারের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের সারমর্ম। এক কথায় বলতে গেলে তিনি তাঁর যুক্তি শানিয়েছেন জ্ঞান বিজ্ঞানকে এমনভাবে ব্যবহার করার পক্ষে যা এক মানবমুখীন কারিগরীর (Technology with a human face) পথ খুলে দেবে। তাঁর বক্তব্য বোধগম্য, যুক্তি শানিত কিন্তু আগাগোড়া প্রশ্নাতীত নয়।

বর্তমান যুগের সংকটকে সুমাচার কারিগরীর, বরং বলা ভাল কারীগরীর স্কেল, তথা আকার-আকৃতির মধ্যে নিহিত দেখেছেন। কিন্তু বইতে তিনি যে এই সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তা বলা যায় না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে এটি সর্বতোভাবে একটি ভুল সিদ্ধান্ত। সাধারণভাবে বলা যায়, আধুনিক বৃহদাকার শিল্প তথা সুপারটেকনোলজির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল জটিলতা (শিল্পের ও জীবনের) এবং মাত্রাতিরিক্ত শক্তি-নির্ভরতা (energy intensive)। কিন্তু সেগুলির মধ্যেকার মানবিক সম্পর্কের অবস্থা বা তাদের লাভ ও লোভসর্বস্বতা কি অনেকটাই সামাজিক পরিমণ্ডলের উপর নির্ভর করে না? তাছাড়া, সুমাচারের বক্তব্য অনুযায়ী—ছোট কারিগরীর অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব অনুযায়ীই সেগুলি মানবমুখীন (ছোট শিল্পের কর্মী-মালিকরা কর্মচারীদের প্রতি বেশী উদার ও সহানুভূতিশীল)—এটাও স্বতঃসিদ্ধ নয়। আধুনিক সুপারটেকনোলজি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হবার আগে উৎপাদন মূলত ছোট কারিগরী ভিত্তিক হ'লেও সামাজিক শোষণ তখন কম তীব্র ছিল না। ছোট কারিগরী সাধারণভাবে মালিকানা ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের কেন্দ্রীভবনের উল্টোদিকে কাজ করে ঠিকই এবং তা নিশ্চয়ই ভারতীয়

পরিস্থিতিতে অধিক কাম্য, কিন্তু শুধুমাত্র শিল্পের আকার আকৃতিই পূর্ণ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না।

দ্বিতীয়ত, কিভাবে ছোট তথা মাঝারি কারিগরী সমাজে ঠাঁই করে নেবে—সে সম্পর্কে সুমাচারের বক্তব্য নিতান্তই ভাসা ভাসা ও অস্পষ্ট। যেমন তাঁর মতে—চারটি স্তরে এই প্রযুক্তিবিদ্যা সমাজে ঠাঁই করে নিতে পারে। প্রথমে স্বল্প কিছু লোক এসব কথা বলবে কিন্তু তারা হবে উপহাস্য। তারপরে সকলে মুখে এর গুণকীর্তন করবে, তৃতীয় স্তরে কিছু কিছু বাস্তব প্রয়াস এবং অবশেষে চতুর্থ স্তরে আসবে একটা ব্যাপক প্রয়োগের আন্দোলন। এরপরই সুমাচার মন্তব্য করেছেন অবশ্য এমন রাজনৈতিক সম্ভাবনা থাকা সম্ভব এবং প্রকৃতপক্ষে তা আছেও, যাতে কোন দেশ সরাসরি চতুর্থ স্তরে চলে যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি এ বিষয়ে না কোন দেশের নামোল্লেখ করেছেন, না ব্যাখ্যা করেছেন সেই রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে। হয়তো সে সম্ভাবনা নিহিত আছে রক্তক্ষয়ী বৈপ্লবিক সামাজিক উত্তরণের মধ্যে। একজন বিবেকী ও শান্তিকামী মানুষ হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই সে পন্থা এড়াতে চান; আর তাই তিনি সঠিকভাবেই সকলকে যেটা বোঝানোর প্রয়াস পান তা হ'ল এই যে আজকের দুনিয়ায় সংকট ঘিরে ফেলেছে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই। উৎপাদন পদ্ধতি ও পণ্য ব্যবহারের ধারাকে (Pattern of Consumption) নতুনভাবে ঢেলে সেজে নতুন জীবনে উত্তরণ ঘটাতে হবে।

এমন কি আধুনিক শিল্পও কিভাবে নিজেকে পুনর্গঠিত করতে পারে, তারও অল্পবিস্তর বিশদ আলোচনা সুমাচার করেছেন বৃটেনের স্কট বাডের এণ্ড কোং-এর উদাহরণ দিয়ে। এর দ্বারা তিনি বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন যে মুনাফাকে সীমিত রেখে, লাভের একটি বড় অংশ সমাজের সেবায় ব্যয় করে, কর্মীদের সঙ্গে যৌথ মালিকানা স্বীকার করে এবং শিল্পসংগঠনকে বৃহৎ, জটিল ও বেশী শক্তিব্যয়নির্ভর না করেও কিভাবে একটি সফল শিল্প পরিচালনা সম্ভব। কিন্তু প্রবাদের "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী"র মতই যে এর পরিণাম তা তাঁরই আক্ষেপোক্তিতে প্রতিফলিত: "(স্কট বাডের এণ্ড কোং-এর উদাহরণ) যদিও সব ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের কাছেই গ্রহণযোগ্য, তবুও বাস্তবে আরও কেউ (এ পথ) গ্রহণ করছে না। মনে হয় একথাই ঠিক যে, বুড়ো কুকুর নতুন কৌশলে শিখতে পারে না। কিন্তু নতুনরাও কি শিখবে না?"

তৃতীয়ত, যে নতুন সামাজিক মূল্যবোধ মানুষকে তার ব্যবহৃত কারিগরীর যথার্থ্য বিচারের দিক নির্দেশ করবে, কোথা থেকে কীভাবে সেই মূল্যবোধ অর্জিত হবে, সে সম্পর্কেও সুমাচার স্পষ্ট পথ নির্দেশ দিতে পারেন নি। তাঁর কথায়—"বিংশ শতাব্দীর মানুষকে সত্য নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে এমন নয়। খৃষ্টীয় মতে, সত্যি বলতে কি মানবজাতির সমস্ত যথার্থ মতানুযায়ী, সত্য বর্ণিত হয়েছে ধর্মীয় ভাষায়। সত্য অবিকৃত রেখে, ভাষা পরিবর্তিত করে নেওয়া যায়, যা সমকালীন অনেক লেখক করেছেনও। সমগ্র খৃষ্টীয় ট্রাডিশনে সুনীতিচতুষ্টয় (Four Cardinal Virtues)-এর মত সূক্ষ্ম ও বাস্তব নীতিশিক্ষা আর কিছুই নেই।" সত্যি কি তাই? যদি ধরেও নেওয়া যায় যে পাশ্চাত্যের মানুষ ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে সুনীতি-বোধ গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ, তাদের জন্য ভাষান্তর প্রয়োজন, এশীয়বাসী, বিশেষত ভারতবাসীর ক্ষেত্রে একথা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়। পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিচারে ভারতের ফারাক বিস্তর। এমন কি যে বৌদ্ধ মতবাদ ও গান্ধীবাদকে সুমাচার তাঁর নতুন মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু হিসবে গণ্য করেছেন এবং যে ধরণের ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর তাঁর আস্থা ভারতবাসীর মধ্যে তার যথেষ্ট প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও শোষণ—বৈষম্য এখানে এমনই তীব্র যে মাথাপিছু বছরে প্রায় ৪০ কেজি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হলেও, শতকরা পঞ্চাশ জন ভারতবাসীই অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত! এমন কি ভারতেও ছোট তথা যথাযথ কারিগরীর বিস্তার দেশী বিদেশী বড় পুঁজির অহিংস—সহিংস আক্রমণে বাধা ও ব্যাধিপ্রাপ্ত। এছাড়া অন্য প্রশ্নও আছে। ধর্মীয় ভাষায় বিবৃত মূল্যবোধ কি ধর্মের আনুষঙ্গিক বোধ ও অভ্যাস থেকে আলাদা করা এত সহজ? তাতে যে নতুন বিপত্তির সম্ভাবনা তা কি তুচ্ছ করার মত? বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আচার আচরণই যে মানুষকে প্রয়োজনীয় নতুন মূল্যবোধে অভিষিক্ত করতে পারে—স্পষ্টতই সুমাচার এ ভরসা করতে পারেন নি।

রবীন মজুমদার
ফলিত রসায়ন বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

তারাপুরে দুর্ঘটনা কিসের ইঙ্গিত বহন করছে ?

[The events leading to the leak of radioactive heavy water in Tarapur Nuclear Power Plant are briefly recounted and the utter negligence and antipeople attitude of the plant authorities and the Government, as manifested in the course of events leading to and following the catastrophe, underlined. Attention has been drawn to the ominous future portended by this and similar other events in neuclear and biological warfare plants at other places in the world.]

বিগত ১৪ই মার্চ তারাপুরে 'চায়না সিনড্রোম'-এর* কোন ভারতীয় ভাষ্যের রিহার্সাল ছিল না। এই দিনটি ছিল তারাপুর পারমাণবিক প্রকল্পের ইতিহাসে এক বিভীষিকাময় দিন। তেজস্ক্রিয় ভারী জল বেরিয়ে এল প্রাথমিক হিম ব্যবস্থার ছিদ্র থেকে। বরফের চাঁই জমিয়ে জল বেরোনো বন্ধ করার চেষ্টা চলল। কিন্তু হা হতোস্মি। তেজস্ক্রিয় ভারী জল বেরিয়ে এল দুর্বার গতিতে ভাসিয়ে দিল চতুর্দিক। কিন্তু থ্রি মাইল আইল্যাণ্ডের মত কোন সোরগোল ছিল না, কোন বিপদ সংকেত ছিল না, কেবল প্রস্তুতি ছিল 'কিছুই ত হয়নি' বলার। লোকসভায় প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী গর্ব করে বললেন, 'কাউকেই জায়গা ছেড়ে যেতে হয় নি—এই খবর আমাদের কাছে আছে।' যাঁরা প্ল্যাণ্ট চালানোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন 'তাঁদের ওপরও কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে নি' বলে দাবী করা হল। এরকম ছোটখাট ঘটনাকে ত' এত বড় দেশের প্রধানমন্ত্রী 'দুর্ঘটনা' আখ্যা দিতে পারেন না—না পারাই স্বাভাবিক। যে দেশে জড়া ব্যাধি অকালমৃত্যু অনাহার নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা, যে দেশের মানুষের বেঁচে থাকারই অধিকার সীমিত সে দেশে তেজস্ক্রিয়তা দূষীকরণের ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ না থাকারই কথা। কিন্তু নেপথ্যে যা ঘটেছিল তা নিছক উড়িয়ে দেওয়ার মত কোন দুর্ঘটনা নয়।

তারাপুরের পারমানবিক শক্তি প্ল্যাণ্টে নিয়মিত চেক্ আপে প্রাথমিক হিম ব্যবস্থা যুক্ত নলে ছিদ্র দেখা গেল। এই প্রাথমিক হিম ব্যবস্থা যুক্ত নলে উত্তপ্ত তেজস্ক্রিয় ভারী জল থাকায় তা ছিদ্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পার্শ্ববর্তী এলাকা দূষিত করতে পারে, আর রিয়্যাক্টরে জল কমে যাওয়ায় প্রচণ্ড তাপে রিয়্যাক্টর কোর গলে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় সৃষ্টি হতে পারে। এই রকম ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে যত দ্রুত সম্ভব হিম ব্যবস্থা যুক্ত নলের ছিদ্র বন্ধ করা প্রয়োজন। আর তা করতে হলে তারাপুর প্ল্যাণ্টের দু' ফুট লম্বা ফাটা নলের পরিবর্তে নতুন নল বসানোর প্রয়োজন ছিল। এই পরিবর্তন করতে গেলেও কিছুক্ষণের জন্য ফাটা নলে তরল নাইট্রোজেনের সাহায্যে বরফের চাঁই জমিয়ে উত্তপ্ত তেজস্ক্রিয় ভারী জল আসা বন্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু তারাপুরে কি ঘটল ? বরফের চাঁই ভেতরকার জলের চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙ্গে গেল—উত্তপ্ত তেজস্ক্রিয় ভারী জল নল দিয়ে বেরিয়ে এসে চতুর্দিক দূষিত করল। যতই জল কমতে লাগল ততই কোর গলে যাওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। কোর গলে যাওয়ার মত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার হাত থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁচা গেলেও সরকারের এই মিথ্যাচার ও ঔদাসীন্যকে কি চূড়ান্ত জনবিরোধী কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না ?

ভবিষ্যতে এরকম দুর্ঘটনা এড়াতে গেলে যে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন তা হল, নিয়মিত চেক্আপের সময় ভেতরের ঊদস্থৈতিক চাপ মাপা হয়েছিল কিনা এবং সেই হিসেব অনুযায়ী বরফের চাঁই জমানো হয়েছিল কিনা ? প্রথমে জ্বালানীর জন্য ও পরে ছিদ্র দেখা দেওয়ায় যে ইউনিট নভেম্বর ১৯৭৯ থেকে বন্ধ, ইঞ্জিনীয়াররা সতর্ক করা সত্ত্বেও সেই ইউনিট তাড়াহুড়ো করে চালু করার চেষ্টা সঙ্গত হয়েছে কিনা ? ছিদ্রটিকে অতি ক্ষুদ্র বলে দুর্ঘটনাকে গোপন করার বা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা আদৌ কোন দায়িত্বশীল মন্তব্য কি না ? তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষতির কারণকে একেবারে নাকচ করে দেওয়ার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না ?

থ্রি মাইল আইল্যাণ্ডের দুর্ঘটনার সাথে সাথে হ্যারিসবার্গের সমস্ত জনসাধারণ যাঁরা রিয়্যাক্টরের দশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাস করেন তাঁদের ঘরের মধ্যে দরজা জানলা বন্ধ করে থাকতে বলা হল। এর পর পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের ভেতর যাঁরা সন্তানসম্ভবা ও শিশু তাঁদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। আর অন্যান্য অধিবাসীদের যে কোন সময় নির্দেশ পেলেই হ্যারিসবার্গ ছেড়ে যেতে বলা হল। অবশেষে হ্যারিসবার্গ বিমানবন্দর কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। তাও হ্যারিসবার্গে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের

* 'চায়না সিনড্রোম' ঠিক থ্রি মাইল আইল্যাণ্ডের দুর্ঘটনার আগে প্রদর্শিত একটি চিত্র। এতে পারমাণবিক চুল্লীর রিয়্যাক্টর কোর গলে গিয়ে কি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হ'তে পারে তা দেখানো হয়েছে।

অবকাশ আছে।

কিন্তু তারাপুরে কি বলা হল? কিছুই হয়নি, কোন তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় নি, যাঁরা কাছাকাছি কাজ করছিলেন তাঁরা কেউ অসুস্থ হন নি, কাছাকাছি এলাকায় বসবাসকারী কাউকে অন্যত্র যেতে হয় নি, একে দুর্ঘটনা বলা চলে না। এমনকি তেজস্ক্রিয়তাজনিত বিপদ আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া হল কোন তেজস্ক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়নি বলে। এর থেকে জনবিরোধী কার্যকলাপ আর কি হতে পারে?

বিশ্বের সবচাইতে বেশীরকম দূষিত প্ল্যান্টগুলির অন্যতম তারাপুর প্ল্যান্টের দুর্ঘটনায় এই চরম সরকারী ও প্রশাসনিক ঔদাসীন্য জনস্বাস্থ্যের, বিশেষ করে প্ল্যান্ট কর্মীদের, এক বিশেষ ক্ষতিসাধন করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। একদিকে যখন কোটি কোটি মানুষ আবহাওয়া দূষীকরণের জন্য প্রাণ হারাচ্ছে, না হয় চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে তখন আবহাওয়া দূষীকরণও দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। তেজস্ক্রিয়তা জনিত দূষীকরণ, রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধাস্ত্র জনিত দূষীকরণ এবং সাধারণভাবে দূষিত আবহাওয়া বিশ্বের মানুষের কাছে এক বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইটালীর মিলান শহরে হ্যারিসবার্গের থ্রি মাইল আইল্যাণ্ডে, সোভিয়েত রাশিয়ার কাশিনো গ্রামে (জীবাণু যুদ্ধাস্ত্রের কারখানার নলে ছিদ্র দেখা দেওয়ায়), ভারতবর্ষের তারাপুর পারমানবিক শক্তি প্ল্যান্টে আর মহাসমুদ্রে তেজস্ক্রিয়তাজনিত যে দূষণের সমস্যা দেখা দিয়েছে তা কি এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে না?

পার্থ সেন
নরসিংহ দত্ত কলেজ

সাম্মানিক স্তরে রসায়নের পাঠ্যসূচী

[The position is put forward that the guiding principles behind a change of syllabus should be to enable the student to understand the subject from a unified point of view and to equip him with an understanding of fundamental principles and current developments without encumbering him with masses of uncorrelated facts. The recent changes introdused in Chemistry Honours syllabus at the degree level are examined with reference to these criteria. Inconsistencies in the syllabus are pointed out. It has been shown that in spite of the declared objective of modernisation the modified syllabus is heavily burdened with traditional concepts and approaches.

নতুন শিক্ষা কাঠামো (১০+২+৩) চালু হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মত সাম্মানিক স্তরেও রসায়ণের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ঘোষিত উদ্দেশ্য যদিও ছাত্রদের রসায়নশাস্ত্রে আরও বেশি প্রশিক্ষিত করে তোলা, তা হলেও এটাকে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না, বরং প্রশ্ন উঠছে যে এটা আদৌ প্রকৃত কোন পরিবর্তন কিনা এবং যদি তা হয় তাহলে এর উদ্দেশ্যই বা কি।

পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা কতকগুলি সাধারণ ও মৌলিক প্রশ্ন বিচার করার চেষ্টা করব। বর্তমান কাঠামোয় সাম্মানিক স্তরে আগের চেয়ে এক বছর বেশি পড়াশুনো করতে হচ্ছে। তা ছাড়াও স্কুল স্তরে পাঠ্যসূচীর এক আমূল পরিবর্তন হয়েছে, এমন কি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদেরও পরমাণুর গঠন শিখতে হচ্ছে। এই পরিবর্তন অতি অবশ্যই সাম্মানিক স্তরে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন দাবি করে। স্কুল স্তরে এক বছর বেশি পড়াশুনো করার ফলে এটা ধরা যেতে পারে যে আগের তুলনায় ছাত্ররা সাম্মানিক স্তরে বেশি জ্ঞানলাভ করে আসে এবং তারই সাথে কিছুটা পরিণত হয়েও আসে, যে কারণে এই স্তরের পাঠ্যসূচী আধুনিক হওয়াই প্রত্যাশিত। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ভৌতবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী যদিও প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে তাহলেও আমরা সেই আলোচনার মধ্যে বর্তমান নিবন্ধে যাচ্ছি না।

পাঠ্যসূচী আধুনিক কি নয় তা নিয়ে যদিও বিতর্কের অবকাশ আছে তাহলেও একটি আধুনিকতম পাঠ্যসূচীর ন্যূনতম শর্ত হল অন্যান্য বিষয়ের অগ্রগতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত থাকা। আধুনিক পাঠ্যসূচী মাত্রেই নতুন নতুন তথ্যের সমন্বয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীগত প্রশ্ন তুলে ধরবে বলে আশা করতে পারি। কিন্তু আলোচিত পাঠ্যসূচীর আধুনিকতা কি এই অর্থ বহন করে? বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে ভুরি ভুরি তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, নতুন তত্ত্বের সৃষ্টি হচ্ছে আর নতুন নতুন

ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে যার ফলে কোন ব্যক্তির পক্ষেই এখন আর সমস্ত বিষয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভব নয়। গত অর্ধ-শতাব্দীতে বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রাণ রসায়ন, কৃষি রসায়ন প্রভৃতি শাখা গড়ে উঠেছে এবং তা নিশ্চয়ই উচ্চ বা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে সাহায্য করেছে। রসায়নের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে একটি মূল সুর প্রোথিত আছে তা বিভিন্ন শাখায় ভৌতবিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকেই স্পষ্ট। বর্তমানে এটা বলা প্রায় অসম্ভব যে পদার্থবিদ্যা কোথায় শেষ হয়েছে আর ভৌত রসায়নের শুরু কোথায়, আর কোথায় রসায়নের শেষ আর প্রাণীবিদ্যার শুরু। যে সমস্ত বিষয় বা ক্ষেত্রগুলি প্রচলিত ধারণায় পৃথক বর্তমানে তাদের আর আলাদা করে ভাবা যায় না। কোন বিষয়ের প্রকৃত মূল্যায়ন সেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। রসায়নের সাম্মানিক স্তরের ছাত্রদেরও ভৌত বিজ্ঞানের এই মূল সুরের সাথে পরিচয় করানো একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই একীকরণের প্রচেষ্টা পাঠ্যসূচীতে আদৌ গুরুত্ব পায় নি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি বিতর্কিত—মতামতের ভিন্নতা আছে এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে। রসায়নের একজন সাম্মানিক স্তরের ছাত্রের কাছ থেকে আমরা কি চাই? নানারকম উত্তর আসে এই প্রশ্নে। তবে আমরা যদি সুষ্ঠু পঠন পাঠনের দৃষ্টিতে দেখতে চাই তাহলে এই প্রশ্নটিকে আমরা এইভাবে বিচার করতে পারি: রসায়নের একজন স্নাতক এই বিষয়ের মৌলিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলি জানবে এবং বিচারবুদ্ধি সহকারে তা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। এই সঙ্গে তাকে নতুন নতুন শাখার সাথেও পরিচিত হতে হবে এবং নতুন নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে কোনরকম দ্বিধা বা রক্ষণশীল মনোভাব রাখা চলবে না। তথ্যের বোঝা বয়ে না বেড়িয়ে বা চলন্ত অভিধান না হয়েও তাকে কিছু তথ্য জানতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হল এই সমস্ত তথ্যকে তত্ত্বের কাঠামোয় বুঝতে হবে। চূড়ান্ত কথা হল এই পাঠ্যসূচীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছাত্রের মধ্যে সৃজনশীল শক্তির বিকাশ ঘটবে কি না।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নিশ্চয়ই আলোচনাসাপেক্ষ, কিন্তু আমি বিষয়টিকে এভাবেই দেখতে চাই। কেবলমাত্র অসংগঠিত তথ্যের বোঝা মনে রাখতে হবে, এইভাবে আমরা পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন চাই না। যখন যে তথ্যের প্রয়োজন হবে তার নির্দিষ্ট সূত্র জানা থাকাই যথেষ্ট। এই নিবন্ধে আলোচ্য বিষয়সূচীর কিছু বিক্ষিপ্ত উদাহরণ থাকায় একে বিচ্ছিন্ন মনে হতে পারে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

আগের সাম্মানিক কোর্সের মতই বর্তমান কোর্সও দুটি অংশে বিভক্ত। পার্ট ওয়ানে থিওরিটিক্যাল পেপারে আছে জৈব রসায়ন (১০০), অজৈব রসায়ন (১০০) আর ভৌত রসায়ন (১০০) আর পার্ট টুতে এই বিষয়গুলি প্রত্যেকটি ৫০ নম্বর করে ত আছেই, তার সাথে একটি পঞ্চাশ নম্বরের ঐচ্ছিক পত্রও আছে, যে পত্রটি শিল্প-রসায়ন, বৈশ্লেষিক রসায়ন, কৃষি রসায়ন এর মধ্য থেকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। থিওরিটিক্যাল পেপারের নম্বরের ভাগ প্রাক্টিকাল পেপারের নম্বরের ভাগের চেয়ে অনেক বেশি সুষম। প্রাক্টিকাল পেপারে নম্বরের ভাগ একপেশে, প্রথম পার্টে ১০০ নম্বর এবং দ্বিতীয় পার্টে ২০০ নম্বর। এর চেয়ে সুষ্ঠু বিভাজন সম্ভব।

থিওরিটিক্যাল পেপারগুলির মধ্যে জৈব রসায়নের পাঠ্যসূচী কিছুটা সঙ্গতিপূর্ণ হলেও 'সনাতন' বিষয়সূচীর ওপরই বেশি নির্ভরশীল। যদিও পাঠ্যসূচীতে এটা খুব স্পষ্ট নয় যে আণবিক স্তরের ব্যাখ্যা কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত কিন্তু এই ঝোঁকটি পাঠ্যসূচীতে নিহিত রয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যেহেতু অনেকগুলি বিষয়সূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই জন্য এই স্তরে তথ্যের বোঝা কমিয়ে দিয়ে এবং রাসায়নিক ধর্মের ওপর জোর দিয়ে পাঠ্যসূচী পুনর্গঠিত করা যেতে পারে। বাড়তি কিছু বিষয়ের রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যেমন, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ইত্যাদি, আবার ডাই এলকাইলেড ও পলিমার সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণাও দেওয়া যেতে পারে। মৌল এবং যৌগের গঠনের বর্ণালী বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং অন্যান্য ভৌতিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হলেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। প্রথম অংশেই এই বিষয়টি থাকা প্রয়োজন ছিল এবং ক্রমাগত প্রয়োগের মাধ্যমে তা শেখা উচিত। বিক্রিয়ার এবং গঠন প্রণালীর বিশ্লেষণে এই পদ্ধতির প্রয়োগ থাকা প্রয়োজন ছিল।

ভৌত এবং অজৈব রসায়নের পাঠ্যসূচীও পুরনো বিষয়সূচীরই পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে এবং জৈব ও অজৈব রসায়নের সাথে ভৌত রসায়নের সম্পর্কের ক্ষেত্রও সুনির্দিষ্ট নয়। অজৈব রসায়নের পাঠ্যসূচীতে যেমন কিছু অপ্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তেমনি কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে। বোর থিওরির আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ সম্ভবতঃ এই স্তরে ততটা প্রয়োজনীয় নয়, কারণ পাওলি এক্সক্লুশন নীতি ও স্রোডিঙ্গার সমীকরণ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেই এই বিষয়গুলি পড়ানো হয়ে থাকে। ইলেকট্রনের বণ্টন ও বন্ধনীর গঠন শেষোক্ত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করেই বোঝা যেতে পারে। পর্যায়সারণী পাঠ্যসূচীতে প্রথম পার্টে ও দ্বিতীয় পার্টে অন্তর্ভুক্ত করে এর উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তসহ প্রথম পার্টেই এই বিষয়টি পড়ানো যেতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের এবং দশার স্থায়িত্ব, আর ভৌত ও তাপগতীয় ধর্মের সাথে যৌগের গঠন-এর সম্পর্ক সমধিক গুরুত্ব পায়নি। কেবলমাত্র জটিল যৌগ, লৌহসংকর ও ম্যাগনেটিক-মোমেন্ট পাঠ্যসূচীতে রয়েছে। অজৈব যৌগগুলির গঠন সনাক্তকরণ পদ্ধতি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি এবং বিশেষ সংযোজন হিসেবে অরগ্যানো-মেটালিক যৌগ অন্তর্ভুক্ত করা হলেও অজৈব অতিকায় অণু উল্লিখিত হয় নি।

রসায়নের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে রসায়নের সম্পর্ক বিস্তৃতি লাভ করলেও পাঠ্যসূচীতে যথাযথ গুরুত্বের সাথে তা উল্লেখ করা হয়নি, উপরন্তু একটা দায়সারা গোছের প্রচেষ্টা হয়েছে বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে ভৌত রসায়নের পাঠ্যসূচীতে কোন পরিবর্তনই হয় নি। ভৌত রসায়ন কেবলমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেই নয়, সাম্মানিক স্তরেও অবহেলিত হয়েছে। ভৌত রসায়নের সাথে পদার্থবিদ্যা ও গণিতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং রসায়নের বিভিন্ন শাখার আন্তঃসম্পর্ক গুরুত্ব না পাওয়ায় এই বিষয়ে এক সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। আদর্শ গ্যাসের সূত্র ও আংশিক চাপের সূত্রের গতি জোর দেওয়ার পরিবর্তে তাপগতি শাস্ত্রের ও গতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এই বিষয়ে ধারণার ওপর জোর দেওয়া উচিত ছিল। ভ্যানডারওয়ালস, ডিট্রিসী ও বার্থেলোর প্রকৃত গ্যাসের সমীকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে শেষোক্ত সমীকরণ দুটোকে সহজেই বাদ দিয়ে ভিরিয়াল, আর. কে., ও বি. ডব্লু, আর. সমীকরণের স্থান পাওয়া উচিত। এর মধ্যে ভিরিয়াল সমীকরণ গুরুত্বের দাবি রাখে। আণবিক সংঘাত ও অণুর ভৌতিক ধর্ম ও প্রকৃতি পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ম্যাক্সওয়েল ডিষ্ট্রিবিউশনের সাথে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স-এর প্রাথমিক ধারণা এই স্তরে দেওয়া যেতে পারে। তরল পদার্থের প্রকৃতির মতই কঠিন পদার্থের অবস্থা একমাত্র কেলাসের গঠনের কিছু অংশ ছাড়া পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তাপগতি শাস্ত্রের নাম পাল্টে 'এনার্জেটিক্স' রাখাটাই মনে হয় এই বিষয়ে একমাত্র আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। ভৌত রসায়নে তড়িৎ-চুম্বকীয়, কোয়ান্টাম এবং স্ট্যাটিস্টিকাল মেকানিকস-এর তত্ত্ব না পড়ানো হলেও জৈব, অজৈব রসায়নে তড়িৎ পৃথকিকরণ, ডাইপোল ও ম্যাগনেটিক মোমেন্ট পাঠ্যসূচীতে রাখা হয়েছে। এর ফলে ভৌত রসায়নের সাথে জৈব ও অজৈব রসায়নের সম্পর্ক ছাত্রদের কাছে পরিষ্কার হয় না এবং বিষয়সূচীর অনুধাবনেও জটিলতা দেখা যায়। অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যসূচী রীতিমতো প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে।

ঐচ্ছিক কোর্সে শিল্প ও বৈশ্লেষিক রসায়নে পাঠ্যসূচীর কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। শিল্প রসায়নের পাঠ্যসূচী এমনভাবেই করা হয়েছে যে তা থেকে মনে হতে পারে সমস্ত শিল্পই বৃহৎ, কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। অন্যদিকে আঞ্চলিক ব্যবহারের উপযোগী ছোট শিল্পের সাথে পরিচিত হওয়ার কোন সুযোগ থাকছে না। ছোট শিল্পের সমস্যা ও প্রকৃতির সাথে অবশ্যই ছাত্রকে ওয়াকিবহাল হতে হবে। এই বিষয়ের তাত্ত্বিক ও বাণিজ্যিক ভিত্তি ছাত্রদের কাছে পৌছে দেওয়া উচিত। নির্দিষ্ট কোড ও স্পেসফিকেশন জানা প্রয়োজন। যেগুলি শিল্পে প্রত্যহ ব্যবহার করা হয় অথচ পুরোপুরি রাসায়নিক পদ্ধতি নয় সেগুলিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ব্যবহারিক কোর্সের এক-চতুর্থাংশ অতি সহজেই প্রথম পার্টে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সিলেবাসে এমন কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা যায় যেগুলি কলেজের পরীক্ষাগারেই স্বচ্ছন্দে করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সরল ক্রোমোটোগ্রাফী, ক্যালোরিমেট্রি ও তড়িৎ রাসায়নিক পদ্ধতি। যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় দামী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তাদের ঐচ্ছিক ক্লাসে রাখা যেতে পারে। বৈশ্লেষিক কোর্সে যৌগের গঠন নির্ধারণ থাকতে পারে।

পাঠ্যসূচীর যে কোন পরিবর্তনই প্রয়োগের বাস্তব অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। বাস্তব অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে কোন পরিবর্তনই যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা যায় না, যদিও আমরা বর্তমান নিবন্ধে বাস্তব অবস্থা ও পাঠ্যসূচীর অসামঞ্জস্য সম্পর্কে আলোচনা করছি না।

আরও অনেক বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু সামান্য কিছু হেরফের ঘটিয়ে আধুনিকীকরণের ভূয়া বুলির আড়ালে এখনও কি আমাদের সেই মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণাই কাজ করছে না।

পার্থ রায়
ফলিত রসায়ন বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : তিন টাকা
যোগাযোগের ঠিকানা :
সম্পাদক, **বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী**
C/o. ডি. এস. এন্টারপ্রাইস
৫২/৯সি, বি. বি গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২

'জ্যাকারি'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গের স্বপরিচালিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মী সংগঠন সমূহের যুক্ত সংগ্রাম কমিটি (JACARI)'র প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৫শে এপ্রিল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে।

স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৭৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী সাহা ইনষ্টিটিউট অভ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স হলে আয়োজিত এক মহতী কনভেনশনের মাধ্যমে 'জ্যাকারি' প্রাথমিকভাবে সাংগঠনিক রূপ পরিগ্রহ করে। সেই কনভেনশনের উদ্বোধন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

'জ্যাকারি' গঠিত হয় মূলতঃ তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (১) সরকারী অর্থে পুষ্ট স্বপরিচালিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে গণতান্ত্রিক পরিচালন কাঠামোর প্রবর্তন, (২) উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বস্তরের কর্মীদের কার্যশর্তাবলী আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত করে 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক বাতিল করা এবং (৩) সেখানকার কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও সংগঠন করার অধিকার অর্জন।

২০শে ফেব্রুয়ারীর কনভেনশনের আহ্বানে রাজ্যের বিভিন্ন স্বপরিচালিত গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী সংগঠনগুলি 'জ্যাকারি'তে যোগদান করতে থাকে। বর্তমানে ১৩টি কর্মীসংগঠন যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সদস্য এবং ৩টি সংগঠন সহযোগী সদস্য হিসেবে যুক্ত আছে। এছাড়া যুক্ত আছে ৩টি ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন।

গত ২৫শে এপ্রিল সাড়ে বারোটায় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের লেক্‌চার হলে প্রায় ২০টি সংগঠন থেকে নির্বাচিত শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে 'জ্যাকারি'র প্রথম বার্ষিক কনভেনশনের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। সভা পরিচালনার জন্য ৪ সদস্যবিশিষ্ট এক সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। এতে ছিলেন জয়ন্ত বসু (সাহা ইনঃ), দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী (বোস ইনঃ), অনিল কুমার ঘোষ (কলেরা রিসার্চ ইনঃ) ও বি, এন, সরকার (বি, আই, টি, এম)। সভাপতিমণ্ডলীকে সাহায্য করার জন্য একটি স্টিয়ারীং কমিটি নির্বাচিত করা হয় যাতে ছিলেন দুজন আহ্বায়ক বিনায়ক দত্তরায় (সাহা ইনঃ) ও জ্ঞান শীল (কলেরা রিসার্চ ইন), সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্য বিশ্বজিৎ দত্তগুপ্ত (সি, জি, সি, আর, আই), দুর্দান্ত রায়, জয়ন্ত দাসগুপ্ত (সাহা ইনঃ), অভীশ দাশগুপ্ত (আই, এস, আই) ও সুব্রত পাল (বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা) এবং নির্মল মালাকার (বোস ইনঃ)।

শোক প্রস্তাব পাঠ ও এক মিনিট নীরবতা পালনের পর অন্যতম আহ্বায়ক জ্ঞান শীল সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিনিধিদের সামনে পেশ করেন। প্রতিবেদনে বিগত এক বছরে জ্যাকারি'র নেতৃত্বে স্বপরিচালিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আন্দোলনের বিভিন্ন দিক্‌গুলি তুলে ধরা হয়েছে – কিছু সীমিত কিন্তু সুনির্দিষ্ট সাফল্য, প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী মনোভাব ও পদক্ষেপের বিপরীতে কর্মীদের দৃঢ় এবং সংগ্রামী মনোভাব, 'জ্যাকারি'র আন্দোলনের প্রতি বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারেব সমর্থন জ্ঞাপন ইত্যাদি। এর পাশাপাশি অবশ্য আন্দোলনের সমস্যা ও সাংগঠনিক দুর্বলতাগুলিও আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মূল লক্ষ্য ও অসমাপ্ত কাজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

অন্যান্যদের মধ্যে প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সহ-সভাপতি কিরন ভট্টাচার্য। বেশ কয়েকজন প্রতিনিধির প্রাণবন্ত আলোচনার পর আহ্বায়ক বিনায়ক দত্তরায় জবাবী বক্তব্য রাখেন। সামান্য কিছু সংশোধনী ও সংযোজনী সহ প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়।

এরপর বিভিন্ন কর্মীসংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের নিজস্ব রিপোর্ট পেশ করা হয়। রিপোর্টে তারা তাদের সাংগঠনিক অবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগত সমস্যাগুলি তুলে ধরেন।

প্রথম বার্ষিক কনভেনশনে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখে একটি জাতীয় বিজ্ঞান নীতি প্রণয়নের জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে রাজাপ্পা মামলায় 'শিল্প' সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায়কে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ না করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও স্বপরিচালিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে সমালোচনা করা হয়। একাধিক প্রস্তাবে

('জ্যাকারি'তে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদ)

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং সমস্ত বরখাস্তের আদেশ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার দাবী জানানো হয়। অন্যদিকে আন্দোলনের সাফল্যের জন্য বিড়লা মিউজিয়ামের কর্মীরা অভিনন্দিত হন।

কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন লোকসভা সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সত্যসাধন চক্রবর্তী। তিনি বলেন যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আন্দোলন ব্যাপক অর্থে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী আন্দোলনেরই অংশ। তাই তিনি তাঁর সংগঠন ও 'জ্যাকারি'র মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনের ওপর জোর দেন। এছাড়া অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দেন সি, এস, আই, আর কর্মী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হরিমোহন ও প্রাক্তন লোকসভা সদস্য রজত চক্রবর্তী।

বিকেল সাড়ে চারটায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গণসংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বহু শিক্ষক-গবেষক এবং কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অতীশ দাসগুপ্ত সংগঠনের এক বছরের কাজকর্মের এবং ভবিষ্যত কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর বলেন এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে একটা সভ্যদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখনও 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক বহাল রয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট হবে অথচ সেখানকার কাজকর্মের ব্যাপারে সাধারণ কর্মী বা জনপ্রতিনিধিদের কোন বলার এক্তিয়ার থাকবে না এ ব্যবস্থা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা দীপেন ঘোষ ও সি, এস, আই, আর কর্মী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হরিমোহন।

'জ্যাকারি'র প্রথম বার্ষিক কনভেনশন উপলক্ষে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রাজ্যের ও রাজ্যের বাইরের বেশ কয়েকটি সংস্থা অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ, তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও শিক্ষা (উচ্চ) মন্ত্রী শম্ভু ঘোষ এবং ASWI, CSIR Federation, ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের অফিসারদের অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা।

Space Donated By

TURNER AND TOOLS
15, GANESH CHANDRA AVENUE,
CALCUTTA-700 013
PHONE : 26-0838

Dealersof :
Workshop & Special Purpose Machinery

হাসপাতালের রোগীদেরকে 'গবেষণা'র গিনিপিগ করা হচ্ছে: দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিট্যুট অফ মেডিকাল সায়েন্স (A.I.I.M.S) হাসপাতালের গবেষক-চিকিৎসকদের এম. ডি ও এম. এস ডিগ্রীর 'গবেষণা'র জন্য ঐ হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের না জানিয়ে তাঁদের উপর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটির ফল রোগীদের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে বলে জানা আছে, আর কয়েকটির ফলাফল সম্পর্কে চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট কিছুই জানা নেই। 'হেপাটিক অ্যামিবিয়সিস' এর রোগীদের উপর এমন তিনটি নতুন নতুন ওষুধের ফল দেখা হচ্ছে যার মধ্যে অন্ততঃ একটির ব্যবহার অন্যান্য বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার জন্য। শিশু বিভাগের চিকিৎসকদের নেওয়া একটি 'গবেষণা' প্রকল্পে উদরাময়ে আক্রান্ত শিশুদের কিড্‌নীর জীবচ্ছেদ ('বায়প্‌সি') নেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে। ইতিমধ্যে আর একটি প্রকল্পে 'আর্থ্রাইটিস'-এর রোগীদের কিড্‌নীর জীবচ্ছেদ করা হচ্ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, কিড্‌নীর জীবচ্ছেদ ক্ষেত্রবিশেষে রোগীদের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একটি বড় ওষুধের কোম্পানীর প্ররোচনায় 'ভাইরাল হেপাটাইটিস'-এর রোগীদের উপর সম্পূর্ণ নূতন একটি ওষুধের ফল পরীক্ষা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ওষুধটি ব্যর্থ হ'লে তার ফল ভোগ করতে হবে রোগীদেরকে, আর সফল হলে ঐ রোগীরা সুস্থ হবেন ঠিকই, তবে তার সঙ্গে কোম্পানীটি চড়া দামে ওষুধটি বাজারে ছেড়ে বিরাট মুনাফা অর্জন করতে থাকবে—দেশের জনসাধারণের উপর ওষুধ কোম্পানীগুলো যে শোষণ চালাচ্ছে তা আরো কিছুটা তীব্র হবে।

এ খবর জানা গেছে হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলিতে পি. টি. আই সংবাদ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষা থেকে।

(সূত্র : ইকনমিক টাইম্‌স, ৬।৫।৮০)

NOTICE

1.	Name of the Newspaper :	Vigyan-O-Vigyan karmi
2.	Place of publication :	52/9C, Bepin Behari Ganguli Street, Calcutta-700012.
3.	Perio icity of publication :	Bimonthly (Once in two months)
4	Printer's Name :	Robin Majumder
	Whether citizen of India :	Indian
	Address :	Dept. of App. Chem , Cal. Univ. College of Science 92, A. P. C. Road, Calcutta-700009
5.	Publisher's Name :	Robin Majumder
	Whether citizen of India :	Indian
	Address :	Dept. of Appl. Chem., Cal Univ. College of Science 92, A P. C. Road, Cal-700009
6.	Editor's Name :	Partha Sen
	Whether citizen of India :	Indian
	Address :	Narasinha Dutt College, Howrah-1.
7.	Owner's Name :	Hiranmay Saha
	Whether citizen of India :	Indian.
	Address :	Dept. of Physics, Univ. of Kalyani, Kalyani, Dt. Nadia.

I, Robin Majumder, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- **Robin Majumder**

Dated : 1. 3. 80 *Signature of the Publisher*

Registration No. <. N. 34929/79 "Registered" Postal Regi. No. WB/CC 113

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে প্রকাশিত জুলাই ১৯৭৯—এপ্রিল ১৯৮০ প্রধান প্রবন্ধাবলীর তালিকা :

জুলাই-আগষ্ট, ১৯৭৯	: পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ—অতীত ও বর্তমান	রবীন চক্রবর্তী
	মহাকাশে ভারতবর্ষ	অভিজিৎ লাহিড়ী
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭৯	: রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধ	পার্থ সেন
	সল্ট-২ চুক্তি : উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য	দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী
	স্কাইল্যাব কোন্ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ?	অশোক ঠাকুর
নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭৯	: বিজ্ঞান আন্দোলনের সন্ধানে	রবীন মজুমদার
	সমাজ ও জীব-বিজ্ঞান—কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন	শান্তনু দত্ত
	Introducing a Document to be noted	এস ভট্টাচার্য
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০	: বিজ্ঞানের নিক্তিতে অপজ্ঞান	বিদ্যুৎ বিশ্বাস
	Problems of Science and Technology and Development in India	সূর্য্য নিয়োগী
	শিশুর শিক্ষা	শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
মার্চ্চ-এপ্রিল, ১৯৮০	: Problems of Science and Technology and Development in India (2)	সূর্য্য নিয়োগী
	Energy Str tegy for India in Science Congress—A Critique	দেবকুমার বসু
	The Future of Nuclear Science in India —A View from the Experts	অমিতাভ দত্ত

For all Electrical, Elctronic, Components and Equipments and any other odd items

Please Contact

D. S. ENTERPRISES

52/9C, B. B. Ganguly Street (1st floor),
Calcutta-700 012

(We also supply Hydrogen, Nitrogen, Oxygen & other cylinders of various capacities, Silica & Quartz tubes of different sizes)

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।